যদি শ্রীকৃষ্ণ না আসতেন

স্বামী সুহিতানন্দ

পরমপূজনীয় সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ,
রামকৃষ্ণ মঠ ও
রামকৃষ্ণ মিশন

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছেন—যখন যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় তখনই ধর্মকে যথাযথভাবে স্থাপন করার জন্য আমি আবির্ভূত হই। স্বামীজী বলেছেন, গীতায় যেখানে যেখানে ভগবান 'আমি' বলেছেন সে-আমি বাসুদেব নন—ভগবানের শক্তি।

আমরা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি পাঠ করলে দেখতে পাই, বৃহত্তর ভারতে মুনিঋষিগণ সর্বত্র বিচরণ করছেন এবং উচ্চতত্ত্বের আলোচনা করছেন। বর্ণাশ্রমপ্রথা প্রবল থাকায় প্রতি ব্যক্তিকে নিজ নিজ বর্ণ এবং আশ্রম অনুসারে জীবনযাপন করতে হত। এত সুশৃঙ্খলার মধ্যে গ্লানির কারণ কী? প্রতিটি জীবই দেহ-মন-বুদ্ধির সমন্বয়। যদি এগুলি পরিশীলিত থাকে, তাহলে তাতে গ্লানির সম্ভাবনা কোথায়? আসলে ভগবানের মায়া-শক্তিতে তিনটি গুণ থাকবেই—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই তিনটি গুণের প্রভাবে মানুষের বুদ্ধির, ধৃতির, জ্ঞানের পার্থক্য হতে বাধ্য।

রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধন—প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে লক্ষ করলে দেখব, প্রত্যেকেই ত্রিসন্ধ্যা অর্চনা, জপ, ধ্যান, দান, গুরুজনের পূজা প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে পালন করছেন। তবে তাঁদের মধ্যে গ্লানি এল কীভাবে?

স্বামীজী বলেছেন, ''It is good to be born in a church but bad to die in a church.'' তাঁরা চার্চের নিয়মের অধীন হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগই

ত্যাগ, পান-মাছ ত্যাগে কী হবে! অতএব বলতে পারি, তাঁরা—রাবণ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি ধর্মের structure ধরেছিলেন কিন্তু ধর্মের spirit ধরতে পারছিলেন না। তাই ভগবানকে আসতে হয়েছিল।

সাধারণত তিনখানি প্রধান গ্রন্থ আছে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে—হরিবংশ, মহাভারত ও ভাগবত। হরিবংশ—শ্রীকৃষ্ণের বংশের রাজন্যবর্গের ইতিহাস —শ্রীকৃষ্ণ সেখানে অনেকের মধ্যে একজন, a face in the crowd। মহাভারত দুই প্রধান রাজবংশের ক্ষমতার লড়াই। কিন্তু তার মধ্যে নানাভাবে ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মনীতি, রাজধর্ম, নানান অনুশাসন থাকায় জগতের যেকোনও মানুষের তার কোনও না কোনও অংশ প্রয়োজনীয় হবেই। তাছাড়া তার মধ্যে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র। মহাভারতে যেখানেই শ্রীকৃষ্ণ অনুপস্থিত, সবই আছে কিন্তু যেন সব আলুনি। শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের 'salt of the earth'.

মহাভারতের প্রধান অবদান গীতা। যদি মহাভারত নাও থাকত—তাহলেও গীতা চিরকালের জন্য মানবসভ্যতার অমৃতের খনি হয়ে থাকত। স্বামীজী বলেছেন, উপনিষদ সত্যকে দেখতে পাচ্ছে কিন্তু গুছিয়ে বলতে পারছে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমাধিস্থ অবস্থায় গীতামুখে যা উচ্চারণ করেছেন তা চিরকালের জন্য মানবসভ্যতার অমৃতের খনি। তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রচলিত ধর্মমত সবগুলিকে নিয়ে সার্বভৌমিক ও সার্বকালিক এক অনবদ্য অবদান। প্রায় সকল অবতার, মহাপুরুষ এবং দেশি বিদেশি বিদ্বজ্জন গীতার আবশ্যকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ—তিনি দার্শনিক হোন, বিজ্ঞানী হোন বা সমাজশিক্ষক হোন। ধার্মিক ব্যক্তির তো কথাই নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—সাধুর কাছে আর কিছু না থাকলেও একখানা গীতা থাকবেই।

তৃতীয় বইটির নাম ভাগবত। বইটি শ্রীকৃষ্ণের লীলাবসানের পর সংগৃহীত বা রচিত। শ্রীকৃষ্ণ জীবৎকালেই ভগবান বলে পূজিত ছিলেন। তাঁর সুদর্শনচক্রকে সমীহ করত না এমন কেউ ছিল না। এত শক্তির অধিকারী হয়েও তিনি দাম্ভিক নন, বিনীত। যখন প্রয়োজন সকলের সামনে, আবার প্রয়োজন শেষ হলেই সকলের পিছনে। তিনি ভারতবর্ষের king maker. রাজসূয় যজ্ঞে তিনি কী দায়িত্ব নিলেন?—অতিথিদের পা ধুইয়ে দেবেন।

ভাগবতে আমরা শ্রীকৃষ্ণের তিনটি রূপ দেখি।

প্রথম, বালগোপাল—মা যশোদার গোপাল। যেমন মধুর তেমন দুষ্টু। একে নিয়ে আদর করা ছাড়া কী করা যায়? এমন লীলা করে গেছেন যে আজ কোটি কোটি মানুষের কাছে গোপালবিগ্রহ সেবা পাচ্ছেন। কত তরুণ-তরুণী বৃদ্ধবৃদ্ধা অনাথ-অনাথা বালগোপালকে কোলে নিয়ে আশ্রয় পেয়েছেন। গোপালের মা-ই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। জগতে যেমন আর সীতাচরিত্র সম্ভব নয়, তেমনই গোপালচরিত্রও সম্ভব নয়। রামলালা, শ্রীগৌরাঙ্গের দুষ্টুমির কথা আমরা পড়েছি কিন্তু গোপাল অনুপম।

দ্বিতীয়, প্রেমাস্পদ। তাঁর রাসলীলা অনন্তকালের সমস্যার সমাধান। কাম জীবের সত্তা। অথচ উন্নত জীবনযাপন করতে হলে কামকে দমিয়ে রাখতে হবে। কাম একটি প্রবৃত্তি, প্রেমও একটি প্রবৃত্তি। প্রেম দিয়ে কামকে দমন করা যায়। যে-বয়সে কৃষ্ণ রাসলীলা করেছেন সেটা কামগন্ধহীন প্রেমের বয়স। তিনি প্রেমকে এমন এক নিষ্কাম প্রেমে উত্তীর্ণ করেছেন যে, মানবসমাজ এই ভাবটিকে একটি সাধনমার্গ হিসাবে গ্রহণ করেছে।

তৃতীয়, তিনি একাধারে আদর্শ সন্ন্যাসী ও আদর্শ গৃহস্থ। তিনি আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভাই, আদর্শ বন্ধু, মিত্র, সখা। কিন্তু কোনও প্রত্যাশা নেই। যশোদার গোপালরূপে, শ্রীরাধিকা ও গোপীদের রসিকরূপে, পঞ্চপাণ্ডবের সখারূপে, দ্রৌপদীর বন্ধুরূপে তিনি আদর্শ চরিত্র।

শ্রীকৃষ্ণের অবদান বুঝতে গেলে তৎকালীন সমাজ ও ধর্মের একটু আলোচনা প্রয়োজন। আমরা

গোবর্ধন ধারণের ঘটনা জানি। কেন কৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করলেন? ইন্দ্র এত বর্ষণ করছেন যে বন্যায় সব ভেসে যায়। তখন শ্রীকৃষ্ণ সকলকে নিয়ে গোবর্ধন পাহাড়ে আশ্রয় নেন। ইন্দ্র কেন বর্ষণ করলেন? কারণ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করেছিলেন। ইন্দ্রযজ্ঞে নরবলির প্রথা ছিল। তখন নরযজ্ঞ একটি রীতি ছিল। প্রমাণ—জরাসন্ধ আর মাত্র চোদ্দো জন রাজাকে বন্দি করতে পারলেই সে শত রাজার মস্তক যজ্ঞে আহুতি দিতে পারত। শিশুপাল, কংস প্রভৃতি তার সহযোগী ছিলেন। ব্যক্তিগত কারণে কুরুপাণ্ডব বিবাদ শুরু হলেও তা একটি সাংস্কৃতিক সংঘর্ষে পরিণত হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ এই বিপজ্জনক প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন যজ্ঞ, হোম, ধূম ব্যতীত মানুষ ভাবতেই পারত না, তাই শ্রীকৃষ্ণকে তাদেরই ভাষায় ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলতে হয়েছে। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে আছে, ''দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।/ স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥''—আত্মসংযমযোগও যজ্ঞ। অর্থাৎ আত্মসংযমকেও যজ্ঞ না বললে লোকে বুঝবে না।

নন্দলাল বসু অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণ

দ্বিতীয় ঘটনা দ্রৌপদী। বড় বড় ধার্মিক পুরুষ—ভীষ্ম দ্রোণ সবাই উপস্থিত। তাঁদের সকলের সামনে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা—তা-ও রাজদরবারে। সকলের মুখ বন্ধ, কেননা তাঁরা ধর্মের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ। প্রচলিত ধর্ম-অনুশাসনানুযায়ী পঞ্চপাণ্ডব দাস—সুতরাং তাঁদের পত্নীর লাঞ্ছনা। তখন Constitution কীরকম ছিল যে নিজের স্ত্রীকে ভাইয়ের কাছে বন্ধক রাখা যেত! এই ধর্মবোধ যত তাড়াতাড়ি নাশ হয় ততই ভাল। যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র, তাঁর কী বিবেক! নিজ স্ত্রীকে ভাইয়ের কাছে বন্ধক রাখছেন। স্মৃতিভ্রংশ আর কাকে বলে? দেশের অনুশাসনই বা কী পর্যায়ে পৌঁছেছিল! দ্রৌপদী তো রাজমহিষী! যদি তাঁর এই দশা—সাধারণ প্রজাদের কী দুরবস্থা কল্পনাও করতে পারব না। এমন অনুশাসনের আসন্ন মৃত্যুই প্রার্থনা করব। ধর্মের গ্লানি আর কত হবে?

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলছে। যুধিষ্ঠির কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে অপদস্থ হয়ে শিবিরে এসে ফুঁসছেন। অর্জুনকে দেখে গালাগাল দিচ্ছেন। এমনকী বলে ফেললেন গাণ্ডীব ত্যাগ করতে। অর্জুন, যিনি যুধিষ্ঠিরকে গুরুর মতো ভক্তি করেন, সোজা তলোয়ার তুলে যুধিষ্ঠিরকে মারতে চলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ মাঝে এসে বাধা দিলেন। অর্জুন বললেন, ''আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, যে আমাকে গাণ্ডীব ত্যাগ করতে বলবে তাকে আমি হত্যা করব।'' কোথায় ভ্রাতৃপ্রেম, কোথায় ধর্মবোধ, কোথায় যুদ্ধজয়! সর্বত্র 'আমি আমি আমি।' এই

দম্ভই তখন ধর্ম। সে ভীষ্মই হোক, দ্রোণই হোক, আর অর্জুনই হোক। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, শ্রীকৃষ্ণ না থাকলে ভারতবর্ষ থেকে ধর্ম, নীতি, প্রীতি সব চলে যেত। কতকগুলি দাম্ভিক অত্যাচারীতে দেশ ছেয়ে যেত।

এবার বুঝতে সহজ হবে শ্রীকৃষ্ণ কী না করেছেন। জরাসন্ধকে বধ করিয়ে গোটা ভারতকে একসূত্রে বাঁধতে চেষ্টা করলেন, নরমেধযজ্ঞ বন্ধ করালেন। যখন দাম্ভিক, অতিলৌকিক শক্তিতে বলীয়ান রাজন্যবর্গকে সংযত করা অসম্ভব দেখলেন তখন 'মিথঃ সংজনয়ন্ কলিম্'—দুই দুষ্ট শক্তির পরস্পর যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে অপশক্তির নাশ করলেন। এমনকী তাঁর নিজ বংশ যাদবকুল পর্যন্ত যেরকম বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল, তাদের কেউ সংযত করতে পারত না। জনমেজয়ের সময় সর্পযজ্ঞে ঋষি বলেছেন, ''পরীক্ষিতের অনুশাসনে আমরা শান্তিতে বাস করতে পারছি।'' ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের দম্ভবোধের রাশ টানায় দেশে শান্তি এল। বেদের কর্মকাণ্ডই মুখ্য হয়ে উঠেছিল, তিনি জ্ঞানকাণ্ডের প্রচলন করে বেদসম্মত বর্ণাশ্রম প্রথা সমাজে ফিরিয়ে আনলেন।

প্রেমেশানন্দ মহারাজ একবার বলেছিলেন, ''The Geeta is the real biography of Sri Ramakrishna.'' আমরা বলি, ''The Geeta is the real biography of Sri Krishna.''

গীতার যেকোনও শ্লোক দেখলেই দেখা যাবে তিনি যেন নিজের জীবনচরিতই বর্ণনা করছেন। ''অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।'' তাঁর সমগ্র জীবন Intense calmness amidst intense activity।

প্রিয়নাথ সিংহের স্মৃতিচারণায় আছে, স্বামীজী বর্ণনা করেছেন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কীভাবে 'Intense calmness amidst intese activity'-র সমন্বয় হয়েছে। কৃষ্ণকে কীভাবে আঁকা উচিত সে-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলছেন, ''শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস?—সমস্ত গীতাটা personified! যখন অর্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি তাকে গীতা বলছেন, তখন তাঁর central idea-টি শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।'' এই বলে স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণকে কীভাবে আঁকা উচিত, নিজে demonstration করে দেখালেন। বললেন, ''এমনি করে সজোরে ঘোড়া দুটোর রাশ টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়ার পিছনের পা-দুটো প্রায় হাঁটুগাড়া গোছ আর সামনের পাগুলো শূন্যে উঠে পড়েছে—ঘোড়াগুলো হাঁ করে ফেলেছে। এতে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একটা বেজায় action খেলছে। তাঁর সখা, ত্রিভুবনবিখ্যাত বীর; দুপক্ষ সেনাদলের মাঝখানে ধনুক-বাণ ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মতো রথের উপর বসে পড়েছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ সেইরকম ঘোড়ার রাশ টেনে চাবুক হাতে সমস্ত শরীরটাকে বেঁকিয়ে তাঁর সেই অমানুষী প্রেমকরুণামাখা বালকের মতো মুখখানি অর্জুনের দিকে ফিরিয়ে স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর প্রাণের সখাকে গীতা বলছেন।... সমস্ত শরীরে intense action আর মুখ যেন নীল আকাশের মতো ধীর গম্ভীর প্রশান্ত! এই হলো গীতার central idea, দেহ জীবন আর প্রাণ-মন তাঁর শ্রীপদে রেখে সকল অবস্থাতেই স্থির গম্ভীর।'' যদি ক্যামেরা থাকত আমরা শ্রীকৃষ্ণের এই রূপটি দেখতে পেতাম।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের কথা ভাবলেও চমকে যেতে হয়। 'Intense activity and intense calmness'-এর আরও evolved প্রতিমূর্তি তিনি। স্বামীজীর একটি বক্তৃতার বিষয় ছিল 'Evolution of God'। আমরা জানি God-এর evolution হয় না, যুগপ্রয়োজন অনুসারে অবতারের লীলাবিলাসে বৈচিত্র্য ঘটে। শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে আমরা ক্ষত্রিয়শক্তির বিকাশ দেখি। বুদ্ধদেব ও আচার্য শঙ্করে বাহুবল নয়—আত্মশক্তির বলই প্রধান। বুদ্ধের অহিংসা, শঙ্করের প্রজ্ঞা, মেধা জগৎ জয়

করেছিল। চৈতন্যদেব ভাব ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা ছিলেন। ভাবোন্মাদে মানবসভ্যতায় এক নূতন উন্মাদনা সৃষ্টি করলেন। ভক্তিভাব, আবেগ বলতে দেশ মোটামুটি নারদীয় ভক্তিসূত্রকেই জানত কিন্তু চৈতন্যদেব ভক্তির জগতে এক মহাপ্লাবন সৃষ্টি করলেন—সাযুজ্য সালোক্য সারূপ্য সামীপ্য সার্ষ্টি, ভাব প্রেম মহাভাব—অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাব প্রভৃতি ভক্তির জগতে এক মহাপ্লাবন বা বিপ্লব।

রাসলীলার বহিঃপ্রকাশ শ্রীচৈতন্যদেব। একই বিগ্রহে তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা—তাই রাসলীলার রস আস্বাদন করতে গিয়ে তাঁকে মহাভাবে মুহুর্মুহু সমাধিস্থ হতে হয়েছিল। গম্ভীরাতে স্বেদ, কম্পন, মহাভাবে তাঁর দেহ শিথিল হয়ে যেত। জিহ্বাতে চিনি দিলে চিনি হাওয়ায় উড়ে যেত। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারেও আমরা মহাভাবের লীলা দেখেছি—শ্রীরাধার দেহে যে-অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা যেত, তার সবগুলি তাঁর শরীরে অহরহ দেখা যেত—এমনকী স্থূল জড়বাদী সভ্যতায় শিক্ষিত মানুষ দিবারাত্র তাঁর মধ্যে এই ভাবের বিকার দেখত।

শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করেছেন কৈশোরে। দেহবোধরহিত স্বামীজী পূর্ণযৌবনে, বিদেশে রূপগুণবতী তরুণীদের সান্নিধ্যে এসেছেন—সন্তানের মতন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতন, আচার্যের মতন। পাছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনে কোনও সন্দেহ জাগে তাই তাঁর অকলঙ্ক চরিত্রে মহামায়া মিথ্যা কালিমা লাগিয়েছেন এবং তা দূর করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা জাগতিক সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী। এক শয্যায় শয়ন করে তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে নিজ ইষ্টদেবী কালীজ্ঞান করেছেন। কামগন্ধহীন এই সম্পর্কের কথা ভাবলে আমরা রাসলীলার প্রকৃত তাৎপর্যটি একটু ধারণা করতে পারি। পুঁথিকার লিখেছেন, ''শ্রীপ্রভু লীলার স্বামী, সঙ্গে মাতাঠাকুরানী,/ সনাতনী সৃষ্টির আধার।/ বিভিন্ন মাত্র ভৌতিকে, এক আত্মা আধ্যাত্মিকে, অভ্যন্তরে দোঁহে একাকার॥/... বুঝ মন ইশারায়, প্রভু আর শ্রীশ্রীমায়,/ রূপে দুঁহু আত্মায় অভেদ।/হৃদে চিত্তে প্রাণে মনে, এক ঠাঁই দুইজনে, তিলেকেও নাহিক বিচ্ছেদ॥''

আমরা বলেছি গীতা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রেরও biography—নিজের জীবনে দেখিয়েছেন সমগ্র গীতা কীভাবে কোনও ব্যক্তি তার জীবনে যেকোনও অবস্থায় পালন করতে পারে। শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে কতরকম আধ্যাত্মিক বিকাশ হত—অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা ইত্যাদি; সেসব কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, শ্রীচৈতন্যভাগবতে লক্ষণা দ্বারা বলা হয়েছে। বাস্তবে অবতারচরিত্রে কতরকমের অবস্থা হয় তার বর্ণনা আমরা পাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে। জ্ঞান-ভক্তি-কর্মযোগে ও রাজযোগে যা যা অনুভূতি সম্ভব, কথামৃত-লীলাপ্রসঙ্গ-পুঁথির পাতায় পাতায় তার বর্ণনা পাই।

গীতায় শ্রীভগবান আত্মহারা হয়ে বললেন, 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহম্'—আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাভূমি। শ্রীরামকৃষ্ণও 'হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে' বলেছিলেন, ''খোলটা ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, এসে বললে, আমি যুগে যুগে অবতার।''